#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

16th to 21st Feb 2026

সূচক

1. জেনারেল স্টাডিজ ১ 01

1.1. সমাজ 01

1.1.1. ভাষার গুরুত্ব: ভারতে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার 01

2. জেনারেল স্টাডিজ ২ 05

2.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা 05

2.1.1. ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের অপরিহার্যতা 05

2.1.2. গোপনীয়তা বনাম স্বচ্ছতার দ্বন্দ্ব: RTI আইন ও DPDP আইনের ভারসাম্য 09

2.1.3. ব্যঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে: সাংবিধানিক নৈতিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা 12

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 16

2.2.1. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির অস্পষ্টতা 16

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার 18

2.3.1. বিমুক্ত জাতিদের (Denotified Tribes) জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণিবিভাগ 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

জেনারেল স্টাডিজ ১

1.1. সমাজ

1.1.1. ভাষার গুরুত্ব: ভারতে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার

প্রেক্ষাপট

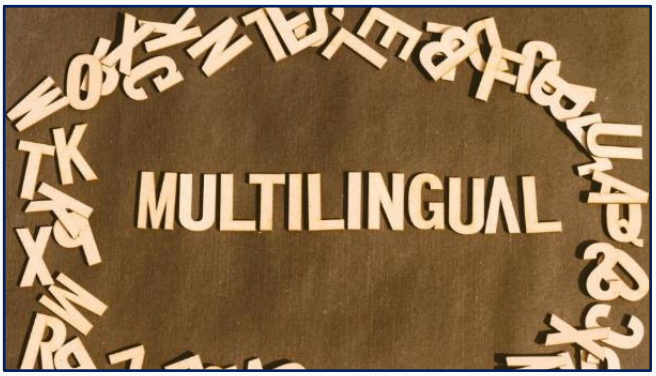

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারি)** উপলক্ষে, যার এবারের মূলভাব (Theme) ছিল **"বহুভাষিক শিক্ষায় যুব কণ্ঠস্বর"**, ইউনেস্কো (UNESCO) তাদের ভারত বিষয়ক সপ্তম শিক্ষা প্রতিবেদন (SOER) ২০২৫ প্রকাশ করেছে। **"ভাষা ম্যাটারস: মাতৃভাষা ও বহুভাষিক শিক্ষা"** শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি শিখন প্রক্রিয়ায় **ভাষাগত পরিচয়ের** গুরুত্বকে জাতীয় স্তরে নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে।

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে **১,৩০০-এরও বেশি মাতৃভাষা** এবং **১২১টি স্বীকৃত ভাষা** রয়েছে। এই সুবিশাল বৈচিত্র্য ভারতের এক অনন্য জাতীয় সম্পদ।

সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বিধি:

- **ধারা ২৯(১):** যে কোনও নাগরিক গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব **ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি** সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করে।
- **ধারা ৩০:** সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দমতো **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা** করার অধিকার দেয়।
- **ধারা ৩৫০এ (350A):** প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।
- **ধারা ৩৫০বি (350B):** ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় একজন **বিশেষ আধিকারিক** নিয়োগের সংস্থান রাখে।
- **অষ্টম তফশিল:** বর্তমানে ভারতের **২২টি দাপ্তরিক ভাষাকে** স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া সংবিধানের **সপ্তদশ পরিচ্ছেদে** সরকারি ভাষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

নীতিগত কাঠামো: সাংবিধানিক এই বিধানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০** এবং **জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF) ২০২২ ও ২০২৩**-এ শিশুর **গৃহভাষা বা মাতৃভাষাকে** প্রাথমিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মাতৃভাষায় মানসম্মত শিক্ষা

ধারণা ও শিক্ষাতাত্ত্বিক ভিত্তি

- **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTBMLE)** পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রাথমিক স্তরে শিশুর **প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা বা গৃহভাষা)**-কে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এবং সুশৃঙ্খলভাবে **অন্যান্য ভাষা** (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **ইউনেস্কো** (UNESCO) এবং **জাতীয় শিক্ষানীতি** (NEP) ২০২০—উভয়ই এই নীতিতে একমত যে, **বুনিয়াদি শিক্ষা** তখনই সবচেয়ে কার্যকর হয় যখন শিশুকে তার **পুরো বোধগম্য** ভাষায় পড়ানো হয়। এটি শিক্ষার্থীর **ধারণাগত স্পষ্টতা**, পঠন-পাঠন এবং শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলে।

জ্ঞানীয় ও বিকাশগত সুবিধাসমূহ

- **শক্তিশালী বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান:** মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরু হলে শিশুরা কোনও অপরিচিত ভাষার পাঠোদ্ধারের অতিরিক্ত মানসিক চাপ ছাড়াই সরাসরি **শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর** ওপর মনোযোগ দিতে পারে।
- **শিক্ষার্থীর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও স্কুলছুট রোধ:** গ্রামীণ ও আদিবাসী স্কুলগুলোর তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের **উপস্থিতি, আত্মবিশ্বাস ও পড়াশোনা শেষ করার হার** বৃদ্ধি করে; বিশেষ করে **প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী** ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
- **আজীবন শিক্ষা ও উচ্চতর দক্ষতা:** মাতৃভাষার মজবুত ভিত্তি পরবর্তী স্তরে **অন্যান্য ভাষা এবং জটিল বিষয়গুলোতে** সহজে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।

NEP ২০২০ এবং NCF-এ নীতির প্রতিফলন

- **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০** সুপারিশ করেছে যে, অন্তত **পঞ্চম শ্রেণি** এবং সম্ভব হলে **অষ্টম শ্রেণি** পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিশুর **গৃহভাষা বা স্থানীয় ভাষা** ব্যবহার করা উচিত।
- **জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF) ২০২২ ও ২০২৩**-এর মাধ্যমে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে **বহুভাষিক শিক্ষণপদ্ধতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উপকরণ** এবং **শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্কারকে** পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে।

ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা: শিখন ও ভাষার অসঙ্গতি

- **ভাষার বাধা:** এনসিইআরটি (NCERT)-র তথ্যমতে, ভারতের প্রায় **৪৪% শিশু** স্কুলে এমন একটি ভাষায় কথা বলে যা শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Instruction) থেকে আলাদা। এটি তাদের শেখার পথে তাৎক্ষণিক এক **ভাষাগত প্রাচীর** তৈরি করে।
- এই শিশুদের জন্য শিক্ষা একটি **দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ** হয়ে দাঁড়ায়: তাদের একই সাথে শিক্ষার মাধ্যমের **পাঠোদ্ধার** করতে হয় এবং **শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** বুঝতে হয়। এর ফলে প্রায়ই তাদের **বুনিয়াদি দক্ষতা** দুর্বল থেকে যায়।
- **ক্রমবর্ধমান শিক্ষার ঘাটতি:** প্রাথমিক স্তরে সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞানের এই দুর্বলতা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে, যা **প্রভাবশালী ভাষা** ও **সংখ্যালঘু ভাষা**ভাষী শিশুদের মধ্যে এক বিশাল বৈষম্য তৈরি করে।
- **আত্মবিশ্বাসের অভাব ও স্কুলছুটের ঝুঁকি:** যারা ক্লাসের পড়া বুঝতে লড়াই করে, তারা ক্রমশ নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে **আদিবাসী, গ্রামীণ এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া** সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ফলে স্কুলছুটের প্রবণতা বেড়ে যায়।
- **সামাজিক স্তরবিন্যাস আরও প্রকট হওয়া:** স্কুলে যখন কেবল প্রভাবশালী ভাষাগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন তা **ভাষাগত সংখ্যালঘুদের** কোণঠাসা করে এবং বিদ্যমান সামাজিক ও শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

এখানে অনুচ্ছেদটির একটি সাবলীল, নির্ভুল এবং যথাযথ পরিভাষা সমৃদ্ধ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

'ভাষা'র গুরুত্ব

- **শিক্ষাগত সাম্য ও অন্তর্ভুক্তি: মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTBMLE)** পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি **প্রধান কৌশল** হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে **তফসিলি জাতি (Dalit), আদিবাসী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো** ভাষার অমিলের কারণে পিছিয়ে পড়বে না।
  - শিশুর **গৃহভাষাকে** শিক্ষার একটি বৈধ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে স্কুলগুলো কেবল পাঠদানের কেন্দ্র নয়, বরং শিক্ষার্থীর **সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের** স্থানে পরিণত হয়।
- **ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** যখন একটি ভাষা হারিয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে যুক্ত একটি **স্বতন্ত্র বিশ্বদর্শন, মৌখিক ঐতিহ্য এবং আদিম জ্ঞানভাণ্ডারও** বিলুপ্ত হয়।

- **ইউনেস্কো** একে মানবতার **সঞ্চিত জ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি** হিসেবে বর্ণনা করেছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি বিপন্ন ও সংখ্যালঘু ভাষাগুলোকে **নথিভুক্ত, পুনরুজ্জীবিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে** সাহায্য করে, যা ভারতের **অস্পৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** রক্ষায় সহায়ক।

- **সামাজিক সংহতি ও জাতীয় পরিচয়:** কেবল হিন্দি বা ইংরেজি নয়, বরং **সব ভাষাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া** একটি বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের **'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'**-কে সুসংহত করে এবং **সামাজিক বন্ধন** দৃঢ় করে।
    - এটি সংবিধানের **অষ্টম তফশিল** এবং ভাষা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানে প্রতিফলিত **ভাষাগত বহুত্ববাদের** প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকেও সমর্থন করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা: আশাব্যঞ্জক কিছু দৃষ্টান্ত

- **ওড়িশার বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম:** ওড়িশা দীর্ঘ সময় ধরে একটি MTBMLE **কর্মসূচি** পরিচালনা করছে, যা ১৭টি জেলার **২১টি আদিবাসী ভাষাকে** অন্তর্ভুক্ত করেছে। দ্বিভাষিক শিক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে প্রায় **৯০,০০০ আদিবাসী শিশু** এই ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে।
    - মূল্যায়ন অনুযায়ী, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে **পঠন-পাঠনের বোধগম্যতা, শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তা এবং স্কুলে টিকে থাকার হার** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **তেলেঙ্গানা ও ডিজিটাল বহুভাষিক সম্পদ:** তেলেঙ্গানায় **দীক্ষা (DIKSHA)** প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষা সহ বিভিন্ন **স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা উপকরণ** ব্যবহার করতে পারছেন।
    - এটি প্রমাণ করে যে, সীমিত সম্পদের মধ্যেও **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)** কীভাবে বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারে।
- **জাতীয় ডিজিটাল ও ভাষা-প্রযুক্তি উদ্যোগ: পিএম ই-বিদ্যা (PM eVIDYA)** এবং **আদি বাণী (Adi Vaani)** বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য **বহুভাষিক অডিও-ভিজ্যুয়াল এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট** সরবরাহ করছে।
    - **ভাষিণী (BHASHINI)** এবং AI4Bharat-এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত প্রযুক্তিগুলো **কণ্ঠস্বর থেকে কণ্ঠস্বর অনুবাদ** এবং **টেক্সট-টু-স্পিচ টুলের** মাধ্যমে ভারতীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করছে। এই প্রযুক্তিগুলো বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ এবং স্থানীয় ভাষায় কন্টেন্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বহুভাষিক মডেল বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ

একটি বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে বেশ কিছু কাঠামোগত এবং সামাজিক বাধা রয়েছে:

কাঠামোগত বাধা:

- **নীতিগত সীমাবদ্ধতা:** অনেক রাজ্যে এখনও সুনির্দিষ্ট **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTB-MLE)** কাঠামোর অভাব রয়েছে, যার ফলে এর বাস্তবায়ন বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে।
- **শিক্ষক সংকট:** আদিবাসী ভাষায় দক্ষ এবং বহুভাষিক শিক্ষণপদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের চরম ঘাটতি রয়েছে।
- **শিক্ষা উপকরণের গুণমান:** সংখ্যালঘু ভাষাগুলোতে পাঠ্যপুস্তক এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব রয়েছে, অথবা সেগুলোর শিক্ষাগত মান সন্তোষজনক নয়।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ:

- **অভিভাবকদের পছন্দ:** অনেক অভিভাবকই **ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে** সামাজিক উন্নতির একমাত্র পথ হিসেবে দেখেন, যা মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি এক ধরণের অনীহা তৈরি করে।
- **ভাষাগত আধিপত্য:** হিন্দি বা ইংরেজির আধিপত্য আঞ্চলিক এবং আদিবাসী উপভাষাগুলোকে অবহেলিত করে রাখছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা:

- **অর্থায়ন:** এই ধরণের উদ্যোগগুলো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বদলে প্রায়ই স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে চলে।

- **ডিজিটাল বিভাজন:** ইন্টারনেট সংযোগের অসমতা দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ডিজিটাল বহুভাষিক শিক্ষা পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নীতি ও বাস্তবায়ন

ইউনেস্কো প্রতিবেদন এবং এনইপি (NEP) ২০২০-এর লক্ষ্যপূরণে একটি বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:

- **জাতীয় MTB-MLE মিশন:** কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রচেষ্টায় সমন্বয় আনতে এবং সফল পাইলট প্রকল্পগুলোকে পদ্ধতিগত সংস্কারে রূপ দিতে একটি জাতীয় মিশন গঠন করা প্রয়োজন।
- **স্থানীয়করণ নীতি:** রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব ভাষাগত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে নীতি তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

- **নিয়োগে অগ্রাধিকার:** স্থানীয় উপভাষায় সাবলীল শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে এবং **B.Ed.** ও **D.El.Ed.** পাঠ্যক্রমে MTB-MLE নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** শিক্ষকদের বহুভাষিক ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারে নিরন্তর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম ও সম্প্রদায়:

- **বহুভাষিক উপকরণ:** সংখ্যালঘু ভাষা সহ সব স্তরের জন্য উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক ও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে।
- **আদিম জ্ঞানভাণ্ডার:** শিক্ষার শেকড় সংস্কৃতির গভীরে পৌঁছে দিতে স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান এবং মৌখিক ইতিহাসকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অভিভাবকদের অংশগ্রহণ:** পাঠ্যক্রমের নকশা ও উপকরণ তৈরিতে অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের যুক্ত করতে হবে।

প্রযুক্তিগত ও আর্থিক অঙ্গীকার:

- **ডিজিটাল সরঞ্জামের বিস্তার:** DIKSHA, PM eVIDYA, BHASHINI এবং AI4Bharat-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।
- **টেকসই অর্থায়ন:** শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও নিবেদিত তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের এই **'ভাষাগত মুহূর্ত'** শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সুযোগ এনে দিয়েছে। ভাষাগত বৈচিত্র্য কোনও বোঝা নয়, বরং এটি **সাম্য, অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্ভাবনের** একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন—যদি শিশুরা তাদের বোধগম্য ও আপন ভাষায় শিখতে পারে। এই পরিবর্তন কেবল একটি শিক্ষণতাত্ত্বিক পছন্দ নয়, বরং **SDG 4** (মানসম্মত শিক্ষা) অর্জনের এক অপরিহার্য শর্ত, যা শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলবে।

প্রশ্ন: *ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য কীভাবে একই সাথে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক সংহতির (social cohesion) চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে? বহুভাষিক শিক্ষা সংস্কারের প্রেক্ষাপটে আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

জেনারেল স্টাডিজ ২

2.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের অপরিহার্যতা

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি ডিএমকে (DMK) সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী **পি. উইলসন** রাজ্যসভায় একটি **বেসরকারি সংবিধান সংশোধনী বিল** পেশ করেছেন। এই বিলটি বিচারবিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে **সামাজিক বৈচিত্র্য** নিশ্চিত করা এবং সুপ্রিম কোর্টের **আঞ্চলিক বেঞ্চ** স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর পুনরায় আলোকপাত করেছে।
- এই উদ্যোগটি মূলত **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার** দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার চেষ্টা করে। বর্তমান ব্যবস্থা ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, বিশেষ করে **তফসিলি জাতি (SC)**, **তফসিলি উপজাতি (ST)**, **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)**, **নারী** এবং **ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের** প্রতিনিধিত্বের অভাবের বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

পটভূমি: বিচারবিভাগীয় নিয়োগের সাংবিধানিক বিধি

ভারতীয় সংবিধান বিচারবিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন একটি কাঠামো তৈরি করেছে যা শাসনবিভাগ (Executive) এবং বিচারবিভাগের (Judiciary) ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

- **ধারা ১২৪:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা **ভারতের প্রধান বিচারপতির (CJI)** সঙ্গে পরামর্শক্রমে **রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে বিচারবিভাগের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **ধারা ২১৭:** হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে **প্রধান বিচারপতি (CJI)**, সংশ্লিষ্ট **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি** এবং **রাজ্যপালের** সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক, যা বহু-পক্ষীয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে।
- **ধারা ১৩০:** সুপ্রিম কোর্টের প্রধান আসন **দিল্লিতে** অবস্থিত হলেও, প্রধান বিচারপতি (CJI) কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন নিয়ে ভারতের অন্য যে কোনো স্থানে সুপ্রিম কোর্টের আসন বা **আঞ্চলিক বেঞ্চ** নির্দিষ্ট করতে পারেন। এর জন্য নতুন কোনো সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজন নেই।
- **ধারা ১৬:** এটি সরকারি চাকরিতে **সমান সুযোগ** এবং সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করে। এই নীতিটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগেও প্রয়োগ করা সম্ভব, যাতে সেখানে সঠিক **সামাজিক প্রতিনিধিত্ব** নিশ্চিত করা যায়।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিবর্তন: কোলেজিয়াম ব্যবস্থা

১. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন**

- **১৯৮০-র দশকের আগে:** মূল সাংবিধানিক নকশা অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের পর নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত শাসনবিভাগ।
- **প্রথম বিচারক মামলা (১৯৮১):** জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার যুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে **শাসনবিভাগের প্রাধান্য** বজায় রাখা হয়।
- **দ্বিতীয় বিচারক মামলা (১৯৯৩):** আগের রায় বাতিল করে **কোলেজিয়াম ব্যবস্থা** গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের জন্য **প্রধান বিচারপতি + ৪ জন প্রবীণতম বিচারপতি** এবং হাইকোর্টের জন্য **প্রধান বিচারপতি + ২ জন প্রবীণতম বিচারপতি**র সমন্বয়ে এই ব্যবস্থা গঠিত হয়, যেখানে বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

- **তৃতীয় বিচারক মামলা (১৯৯৮):** কোলেজিয়ামের ভূমিকা আরও বিস্তৃত করা হয়। সরকার একবার আপত্তি জানাতে পারে, কিন্তু কোলেজিয়াম সেই সুপারিশ পুনরায় পাঠালে তা মানা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক। এর ফলে নিয়োগে **বিচারবিভাগের চূড়ান্ত আধিপত্য** প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী**

- **কার্যপদ্ধতি:** মেধা, জ্যেষ্ঠতা এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে কোলেজিয়াম নাম প্রস্তাব করে এবং তা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে পাঠায়। সরকার পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোলেজিয়ামের হাতেই থাকে।
- **বর্তমান পরিস্থিতি (২০২৬):** বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট তার পূর্ণ অনুমোদিত **৩৪ জন বিচারপতির** শক্তি নিয়ে কাজ করছে। তবে ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী হাইকোর্টগুলিতে **৩৩১টি শূন্যপদ** রয়ে গেছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতাকে প্রকট করে।
- **স্বচ্ছতার প্রচেষ্টা:** স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে একটি নতুন **মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর** (MoP) তৈরির নির্দেশ দেয়। ২০১৭ সালে এটি চূড়ান্ত হলেও সরকার তা গ্রহণ করেনি।

৩. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ**

- **বিচারক মামলাসমূহ (Judges Cases):** কোলেজিয়াম ব্যবস্থাকে সংবিধানের **মৌলিক কাঠামো** (Basic Structure) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।
- **চতুর্থ বিচারক মামলা (২০১৫):** ২০১৪ সালের **৯৯তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে **জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন** (NJAC) গঠন করা হয়েছিল। এতে প্রধান বিচারপতি, ২ জন প্রবীণ বিচারপতি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকার কথা ছিল।
- **সুপ্রিম কোর্টের রায়:** ৫:০ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট এই কমিশনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করে। আদালতের মতে, এটি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও মৌলিক কাঠামোকে লঙ্ঘন করেছে।
- **যুক্তি:** আইনমন্ত্রী ও অ-বিচারবিভাগীয় সদস্যদের উপস্থিতিতে শাসনবিভাগের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল; ফলে পুনরায় কোলেজিয়াম ব্যবস্থা ফিরে আসে।

বিচারবিভাগে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিল

এই বিলটি মেধার সঙ্গে আপস না করেই বিচারবিভাগে **বৈচিত্র্য** এবং বিচারে **সর্বজনীন প্রবেশাধিকার** নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেয়।

- **বৈচিত্র্যের ম্যান্ডেট:** সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী **তফসিলি জাতি** (SC), **তফসিলি উপজাতি** (ST), **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি** (OBC), **নারী** এবং **ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের** জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- **সময়সীমা:** কোলেজিয়ামের সুপারিশ পাওয়ার পর কেন্দ্র সরকারকে সর্বোচ্চ **৯০ দিনের** মধ্যে তা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।
- **আঞ্চলিক বেঞ্চ:** দিল্লি (প্রধান বেঞ্চ) ছাড়াও **কলকাতা**, **মুম্বাই** এবং **চেন্নাইয়ে** সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আঞ্চলিক বেঞ্চ স্থাপন করা।
- **এক্তিয়ার:** এই আঞ্চলিক বেঞ্চগুলি সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ এক্তিয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে; কেবল **সাংবিধানিক বিষয়গুলি** দিল্লির মূল 'কনস্টিটিউশন বেঞ্চ'-এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- **যৌক্তিকতা:** এটি বিচারে সাধারণ মানুষের **প্রবেশাধিকার** উন্নত করবে, দিল্লির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা কমাবে এবং **ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা** দূর করবে। উল্লেখ্য যে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে **৯০,০০০-এর বেশি মামলা** বকেয়া রয়েছে।

ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

১. **দীর্ঘস্থায়ী প্রতিনিধিত্বের অভাব দূরীকরণ**

ভারতের বহুমাত্রিক সমাজের প্রতিফলন বিচারবিভাগে থাকা আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান তথ্য এক হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরে:

- **২০১৮-২০২৪ হাইকোর্ট নিয়োগ (৭১৫ জন বিচারক):** মাত্র **২২ জন তফসিলি জাতি** (SC), **১৬ জন তফসিলি উপজাতি** (ST), **৮৯ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি** (OBC) এবং **৩৭ জন সংখ্যালঘু** নিযুক্ত হয়েছেন (অর্থাৎ মাত্র প্রায় **২৩%** প্রান্তিক গোষ্ঠী থেকে)।
- **সুপ্রিম কোর্ট:** ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮৭ জন বিচারপতির মধ্যে মাত্র **১১ জন মহিলা** (~৮%)। আজও কোনও **SC/ST মহিলা** বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত হননি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু থেকে মাত্র একজন নারী নিযুক্ত হয়েছিলেন (**বিচারপতি ফাতিমা বিবি**)।
- **বার (Bar) থেকে সরাসরি নিয়োগ:** সরাসরি আইনজীবীদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়—যেখানে **৯ জন পুরুষ** সরাসরি নিযুক্ত হয়েছেন, সেখানে মহিলা মাত্র **১ জন** (**বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা**)।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির পথে কাঠামোগত বাধা**

ব্যক্তিগত মেধার অভাব নয়, বরং কাঠামোগত বাধাগুলোই নারী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অগ্রগতিকে সীমিত করেছে:

- **বিলম্বিত নিয়োগ:** মহিলা বিচারকদের প্রায়ই ক্যারিয়ারের অনেক দেরিতে উচ্চতর বিচারবিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা তাঁদের কার্যকাল (Tenure) সংক্ষিপ্ত করে দেয় এবং জ্যেষ্ঠতা (Seniority) অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।
- **সংক্ষিপ্ত কার্যকাল:** অনেক মহিলা বিচারপতি ৩ বছরেরও কম সময় দায়িত্ব পালন করেছেন, যা আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাঁদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ কমিয়ে দেয়।
- **সুযোগের সীমাবদ্ধতা:** এই কাঠামোগত সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কোনো সুসংগত ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিধিত্বের অভাবের এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে।

৩. **ন্যায়বিচারের গুণগত মান ও সামাজিক বৈধতা**

বিচারবিভাগে একজাতীয়তা (Homogeneity) গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল করে, যা শেষ পর্যন্ত জনমনে আস্থার অভাব তৈরি করে:

- **দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা:** বৈচিত্র্যহীন বেঞ্চ অনেক সময় প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, **হাথরাস ধর্ষণ মামলায়** দলিত মহিলার জবানবন্দি খারিজ হওয়া বনাম **২০১২ সালের দিল্লি গণধর্ষণ মামলায়** তা গ্রহণ করার তুলনামূলক বিতর্কটি উল্লেখযোগ্য।
- **গণতান্ত্রিক ঘাটতি:** সংসদ বা সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ থাকলেও বিচারবিভাগে তার অনুপস্থিতি একে সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- **প্রতিষ্ঠানের বৈধতা:** বৈচিত্র্যময় বিচারকরা আইনি ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপ, লিঙ্গ সংবেদনশীলতার বিষয়ে **বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন** এবং উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে **বিচারপতি লায়লা শেঠের** অবদান অনস্বীকার্য।

৪. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা**

কোলেজিয়াম ব্যবস্থা প্রায়ই তার অস্বচ্ছতা এবং সামাজিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার জন্য সমালোচিত হয়:

- **স্বজনপোষণ ও অস্বচ্ছতা:** নির্দিষ্ট কোনও কার্যকরী 'মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর' (MoP) না থাকায় নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ বলে গণ্য হয়। বিচারপতি দীপক মিশ্রর সময় স্বচ্ছতার চেষ্টা করা হলেও তা স্থায়ী হয়নি।
- **"মেধার মিথ" এবং সামাজিক পুঁজি:** সমাজবিজ্ঞানী সতীশ দেশপান্ডের মতে, মেধার আড়ালে অনেক সময় উচ্চবর্ণের সামাজিক সুবিধা এবং নেটওয়ার্ক লুকিয়ে থাকে।
  - ইয়েল অধ্যাপক ড্যানিয়েল মার্কোভিটস একে একটি **"মেরিটোক্র্যাসি ট্র্যাপ"** হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
  - **ডঃ বি.আর. আম্বেদকর** সতর্ক করেছিলেন যে, যদি কাউকে সামাজিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তার মেধা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

- **লিঙ্গ অন্ধত্ব:** কোলেজিয়াম মূলত প্রবীণতম পুরুষ বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। এর ফলে পারিবারিক আইন বা কর্মক্ষেত্রে হেনস্থার মতো মামলায় বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক সেরা উদাহরণ

কোলেজিয়াম ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করতে ভারত আন্তর্জাতিক কিছু মডেল অনুসরণ করতে পারে:

- **যুক্তরাজ্য :** এখানে বিচারক, আইনজীবী এবং **সাধারণ নাগরিকদের (Lay members)** নিয়ে একটি স্বাধীন কমিশন কাজ করে। এটি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেবল বিচারকদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখে না এবং আইনি বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করে।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা :** স্বচ্ছতার দিক থেকে এটি একটি বিশ্বসেরা মডেল। এদের সংবিধানেই বলা আছে যে বিচারবিভাগে দেশের জাতিগত ও লিঙ্গগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হতে হবে।
- **কেনিয়া:** কেনিয়ায় বিচারপতি নিয়োগের জন্য **প্রকাশ্যে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার** নেওয়া হয়। এই স্বচ্ছতা জনমনে গভীর বিশ্বাস তৈরি করে এবং বিচারকের আইনি জ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক সংবেদনশীলতাও যাচাই করে।

ভবিষ্যতের পথ: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিচারবিভাগের জন্য সংস্কার

- **বিচারবিভাগের স্ব-সংস্কার:** কোলেজিয়ামের উচিত স্বেচ্ছায় **বৈচিত্র্যকে** অগ্রাধিকার দেওয়া এবং স্বচ্ছতার জন্য বার্ষিক **জাতিগত ও লিঙ্গভিত্তিক তথ্য** প্রকাশ করা।
- **সাংবিধানিক সংশোধনী: ১৬ নম্বর ধারার** যুক্তিকে **১২৪ ও ২১৭ নম্বর ধারায়** প্রসারিত করা; ১০৪তম সংশোধনীর আদলে **আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** বাধ্যতামূলক করা।
- **এনজেএসি (NJAC)-র পুনরুজ্জীবন:** একটি ব্যাপকভিত্তিক কমিশন গঠন করা প্রয়োজন যা:
  - প্রান্তিক মেধাবীদের খুঁজে বের করতে একটি **'ডাইভারসিটি সেক্রেটারিয়েট'** গঠন করবে।
  - স্বাধীনতা রক্ষায় **বিচারকদের সংখ্যাধিক্য** বজায় রাখবে, তবে সামাজিক প্রেক্ষিত বুঝতে **বিশিষ্ট নাগরিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের** অন্তর্ভুক্ত করবে।
  - চূড়ান্ত সুপারিশের আগে **বার কাউন্সিল** বা জনসমীক্ষার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করবে।
- **আঞ্চলিক বেঞ্চ:** ল কমিশন ও সংসদীয় প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী **১৩০ নম্বর ধারা** প্রয়োগ করে **কলকাতা** থেকে শুরু করে আঞ্চলিক বেঞ্চের বিস্তার ঘটানো।
- **আইন প্রণয়ন:** নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে সামাজিক পটভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করতে **'জুডিশিয়াল ডাইভারসিটি অ্যাক্ট'** পাস করা।
- **তথ্য স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** আইন মন্ত্রক ও বিচারবিভাগ কর্তৃক বার্ষিক **মেশিন-রিডেবল রিপোর্ট** প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা; এই তথ্যকে RTI-এর অন্তর্ভুক্ত করা যাতে নাগরিক সমাজ নজরদারি চালাতে পারে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে নিয়োগের ঘাটতি পূরণ করা যায়।
- **নিম্ন আদালতকে 'পাইপলাইন' হিসেবে শক্তিশালী করা:** নিম্ন আদালতে স্বচ্ছ নিয়োগ, পদোন্নতিতে সংরক্ষণ এবং SC/ST/OBC **ও নারী** প্রার্থীদের জন্য বৃত্তি ও মেন্টরশিপ নিশ্চিত করা; উচ্চতর বিচারবিভাগের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় 'ট্যালেন্ট পুল' তৈরি করা।
- **সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর:** বিচারকদের জন্য লিঙ্গবিচার, জাতিগত সমীকরণ ও প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা নিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা মডিউল চালু করা; বৈচিত্র্যকে কেবল 'কোটা রাজনীতি' হিসেবে না দেখে **সাংবিধানিক সমতা ও বৈধতার** অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

উপসংহার

আম্বেদকর বলেছিলেন, **"সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না।"** একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বেঞ্চ গঠন মেধার সঙ্গে আপস নয়, বরং সাম্যের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণ। যে বিচারবিভাগ তার গঠনে বৈচিত্র্যময়, তা বিচারবিবেচনায় আরও শক্তিশালী এবং ন্যায়বিচারে আরও সঠিক হবে।

প্রশ্ন: *"বিচারবিভাগের স্বাধীনতা এবং বিচারবিভাগীয় বৈচিত্র্য একে অপরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক সাংবিধানিক মূল্যবোধ।" ভারতের বিচারবিভাগীয় নিয়োগের প্রেক্ষাপটে এটি আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.2. গোপনীয়তা বনাম স্বচ্ছতার দ্বন্দ্ব: RTI আইন ও DPDP আইনের ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট

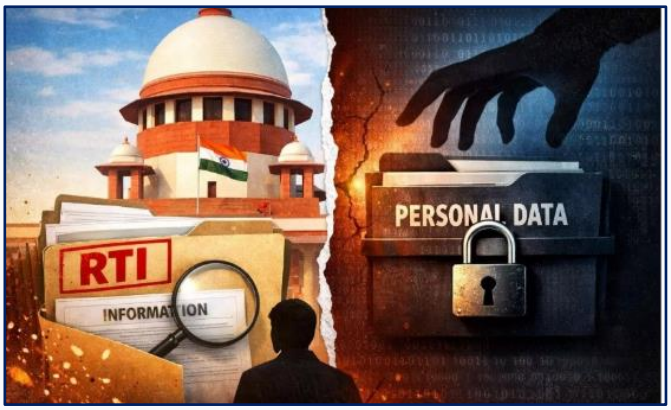

- সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন (DPDP) আইন, ২০২৩** থেকে উদ্ভূত **"সাংবিধানিক সংবেদনশীলতা"** নিরসনের জন্য একগুচ্ছ আবেদন একটি **সংবিধান বেঞ্চে** পাঠিয়েছে।
- এই আবেদনগুলোতে **তথ্য অধিকার (RTI) আইন, ২০০৫**-এর **ধারা ৮(১)(জে)** সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যাকে সমালোচকরা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার ওপর এক "মরণ আঘাত" হিসেবে অভিহিত করেছেন।
- ভারতের **প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত** মন্তব্য করেছেন যে, আদালতের এখন **"ব্যক্তিগত তথ্য"**-এর সীমানা আইনিভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাতে গোপনীয়তার অধিকারের দোহাই দিয়ে নাগরিকের জানার মৌলিক অধিকারকে অন্যায়ভাবে স্তব্ধ না করা হয়।

পটভূমি: আইনি কাঠামোর বিবর্তন

বর্তমান আইনি লড়াইটি দুটি ভিন্ন অধিকারের মধ্যে মৌলিক সংঘাতের প্রতিফলন, যা ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

১. **RTI আইন, ২০০৫: "সূর্যালোক" আইন**

RTI আইন কেবল কোনো প্রশাসনিক উপহার ছিল না; এটি সংবিধানে বিদ্যমান একটি অধিকারের আনুষ্ঠানিক সংকলন ছিল।

- **সাংবিধানিক ভিত্তি: "জানার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৯)**
  - **স্টেট অফ ইউপি বনাম রাজ নারায়ণ (১৯৭৫):** এই ঐতিহাসিক মামলায় বিচারপতি ম্যাথু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন: *"আমাদের মতো একটি দায়িত্বশীল সরকারে... এই দেশের জনগণের প্রতিটি সরকারি কাজ এবং জনস্বার্থে করা সমস্ত কিছু জানার অধিকার রয়েছে।"*
  - **যুক্তি:** আদালত রায় দিয়েছিল যে, নাগরিকদের কাছে তথ্য না থাকলে **বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ))** অর্থহীন। তথ্য গোপন রাখলে নাগরিকরা কোনো মতামত দিতে বা সরকারকে দায়বদ্ধ করতে পারে না। তাই RTI হলো অনুচ্ছেদ ১৯-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
  - **দর্শন:** এটি শাসনব্যবস্থাকে "অফিসিয়াল সিক্রেসি" থেকে **"পাবলিক ট্রাস্ট"**-এর দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, তথ্য জনগণের সম্পদ এবং রাষ্ট্র কেবল তার রক্ষক।

- **আন্দোলন:** ১৯৯০-এর দশকে অরুণা রায়ের নেতৃত্বে **মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন** (MKSS) রাজস্থানে একটি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। তাদের বিখ্যাত স্লোগান ছিল: *"হামারা পয়সা, হামারা হিসাব"*।
- **মূল ধারা ৮(১)(জে): একটি সুষম ছাড়** এটি ছিল তথ্যের সুরক্ষাকবচ, যা কেবল তখনই তথ্য প্রকাশে বাধা দিত যদি:
  - তথ্যের সাথে কোনো জনস্বার্থ বা সরকারি কাজের সম্পর্ক না থাকে।
  - তথ্য প্রকাশ করলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে অহেতুক হস্তক্ষেপ হয়।
- **"জনস্বার্থ" অগ্রাধিকার (Public Interest Override):** তথ্য ব্যক্তিগত হলেও, যদি জনতথ্য কর্মকর্তা (PIO) মনে করতেন যে "বৃহত্তর জনস্বার্থ" ব্যক্তিগত ক্ষতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই তথ্য প্রকাশ করা যেত। এমনকি আইনে স্পষ্টভাবে বলা ছিল: *যে তথ্য সংসদ বা রাজ্য বিধানসভাকে দিতে অস্বীকার করা যায় না, তা কোনো নাগরিককেও অস্বীকার করা যাবে না।*

২. DPDP আইন, ২০২৩: গোপনীয়তার ঢাল

এই আইনটি ডিজিটাল যুগে "তথ্যগত গোপনীয়তা" (Informational Privacy) সুরক্ষায় একটি নতুন স্তর যুক্ত করেছে।

- **সাংবিধানিক ভিত্তি: "গোপনীয়তার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ২১)**
  - **পুট্টস্বামী মামলা (২০১৭):** ৯ বিচারপতির একটি বেঞ্চ গোপনীয়তাকে **অনুচ্ছেদ ২১**-এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে।
  - **তিনটি শর্ত** (Three-fold Test): আদালত জানিয়েছে সরকার কেবল তখনই গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি তা তিনটি শর্ত পূরণ করে: **বৈধতা** (লিখিত আইন), **ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য** (জাতীয় নিরাপত্তা বা জনকল্যাণ), এবং **আনুপাতিকতা** (উদ্দেশ্য পূরণে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ)।
- **সংশোধনী (ধারা ৪৪(৩)): "সার্বিক নিষেধাজ্ঞা"**
  - DPDP আইনটি RTI আইনের ৮(১)(জে) ধারা থেকে "জনস্বার্থ" সংক্রান্ত ভারসাম্যমূলক মানদণ্ডটি মুছে দিয়েছে।
  - এর পরিবর্তে একটি কঠোর নিয়ম আনা হয়েছে: যে কোনো **"ব্যক্তিগত তথ্য"** এখন প্রকাশের আওতামুক্ত।
  - **সমস্যা:** "জনস্বার্থ" রক্ষার সুযোগটি সরিয়ে দেওয়ার ফলে এটি **'আনুপাতিকতা তত্ত্ব'** (Proportionality Doctrine) লঙ্ঘন করে। এটি গোপনীয়তাকে এমন এক ঢাল হিসেবে তৈরি করে, যা দুর্নীতি ফাঁস বা সরকারি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিচারবিভাগীয় নজির: সি.পি.আই.ও (CPIO) বনাম সুভাষ চন্দ্র আগরওয়াল (২০১৯)

- সুপ্রিম কোর্ট এর আগে রায় দিয়েছিল যে, স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তা হলো সমমর্যাদার অধিকার। আদালত জানিয়েছিল যে, বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ বা নিয়োগ সংক্রান্ত নথি প্রকাশ করা যেতে পারে যদি তা কোনো **ন্যায়সঙ্গত জনস্বার্থ** পূরণ করে।
- ২০২৩ সালের সংশোধনীটি **'জনস্বার্থ'** (Public Interest)-এর এই পথটিকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী বিচারবিভাগীয় নজিরকে অগ্রাহ্য করেছে। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত বিষয়গুলোতে RTI আইন কার্যত **'অচল'** হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে RTI আইনের গুরুত্ব

- **অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের সুরক্ষা:** স্বচ্ছতা হলো একটি **"সদর্থক সরকারের"** ভিত্তি। RTI আইন নিশ্চিত করে যে **'সার্বভৌম' (জনগণ)** যেন কার্যকরভাবে **'এজেন্ট' (রাষ্ট্র)**-এর ওপর নজরদারি চালাতে পারে। এটি গণতন্ত্রকে কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দৈনন্দিন তদারকির স্তরে নিয়ে যায়।

- **সামাজিক অডিট ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা:** প্রান্তিক মানুষের জন্য **রেশন (PDS) বণ্টন**, MGNREGA-র মজুরি এবং পেনশনের তালিকা যাচাই করার এক অপরিহার্য হাতিয়ার হলো RTI। ভুয়া সুবিধাভোগী (Ghost Beneficiaries) রুখতে এই তালিকায় ব্যক্তিগত তথ্য থাকা জরুরি, যা RTI-এর মাধ্যমে স্বচ্ছ রাখা সম্ভব হয়।
- **দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শৃঙ্খলামূলক রেকর্ডের ওপর নজরদারি চালানোর সুযোগ দেয় এই আইন। এটি সরকারি পদের সততা বজায় রাখতে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে সাহায্য করে।
- **সততা নিশ্চিতকরণে RTI ও ই-গভর্ন্যান্সের সাফল্য:** ২০০৫ সাল থেকে RTI অসংখ্য বড় দুর্নীতি ফাঁস করেছে। যেমন:
  - **আদর্শ হাউজিং সোসাইটি কেলেঙ্কারি:** কার্গিল যুদ্ধের বিধবাদের জন্য বরাদ্দ আবাসন কীভাবে প্রভাবশালীরা দখল করেছিল, তা RTI-এর মাধ্যমেই সামনে আসে।
  - **২জি স্পেকট্রাম ও কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি:** টেলিকম স্পেকট্রাম বণ্টনে অনিয়ম এবং সরকারি তহবিলের বিশাল ক্ষতি এই আইনের সাহায্যেই উন্মোচিত হয়।
  - **ব্যাপম (Vyapam) কেলেঙ্কারি:** মধ্যপ্রদেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও নিয়োগে বড় ধরনের জালিয়াতি ফাঁস করতে RTI আবেদনগুলো বড় ভূমিকা পালন করেছিল।
- **ই-গভর্ন্যান্স ও RTI-এর পরিপূরকতা:** RTI হলো তথ্যের **'চাহিদা'** (নাগরিকের চাওয়া), আর ই-গভর্ন্যান্স হলো তথ্যের **'যোগান'** (সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ)। **'ভূমি'** (ডিজিটাইজড রেকর্ড), GeM (স্বচ্ছ কেনাকাটা) এবং DBT (সরাসরি অর্থ হস্তান্তর)-এর মতো প্রকল্পগুলো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

RTI-DPDP সংঘাতের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ

- **'লেজিটিমেট ইউজ' (Legitimate Uses) বা বৈধ ব্যবহারের বৈপরীত্য:** DPDP আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, জনকল্যাণের জন্য সরকার নাগরিকদের সম্মতি ছাড়াই তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু RTI সংশোধনী নাগরিকদের সরকারি তথ্য পেতে বাধা দিচ্ছে। এতে একটি **'একমুখী আয়না' (One-way Mirror)** তৈরি হচ্ছে—যেখানে রাষ্ট্র নাগরিকের ওপর নজর রাখতে পারবে, কিন্তু নাগরিক রাষ্ট্রের কাজ তদারকি করতে পারবে না।
- **সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর বিরূপ প্রভাব:** অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের **'ডেটা ফিকুশিয়ারি' (Data Fiduciaries)** হিসেবে চিহ্নিত করা হতে পারে। DPDP আইনের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘনে **২৫০ কোটি টাকা** পর্যন্ত জরিমানার বিধান সাংবাদিকদের সরকারি প্রেস রিলিজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারে।
- **আনুপাতিকতা পরীক্ষার (Proportionality Test) ব্যর্থতা:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে, কোনো মৌলিক অধিকার খর্ব করতে হলে তা হতে হবে "ন্যূনতম হস্তক্ষেপকারী"। কিন্তু **'জনস্বার্থের অগ্রাধিকার' (Public Interest Override)** মুছে ফেলা যুক্তিবিরোধী; কারণ এটি **জানার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯)** এবং **গোপনীয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)**-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার

- **অনুচ্ছেদ ১৯ এবং অনুচ্ছেদ ২১-এর মধ্যে সমন্বয়:** আমাদের 'জানার অধিকার' এবং 'গোপনীয়তার অধিকার'-এর মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনোটিকেই অন্যটির অধীনস্থ করা উচিত নয়।
  - সংবিধান বেঞ্চের উচিত ২০১৯ সালের **'সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার' (CPIO)** মামলার রায়ের চেতনাকে বজায় রাখা, যেখানে বলা হয়েছিল যে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা স্বচ্ছতার প্রয়োজনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। একইভাবে, আদালত 'ব্যক্তিগত তথ্য' আসলে কী, তা নির্ধারণ করতে পারে।
- **তথ্য অনুসন্ধানকারীদের সুরক্ষা:** অধিকারকর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে **'হুইসেলব্লোয়ার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৪'** দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

- **সাংবাদিকদের জন্য আইনি সুরক্ষা:** ভারতের উচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের **GDPR মডেলের** মতো বিধান গ্রহণ করা, যেখানে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংবাদমাধ্যমগুলো আর্থিক ক্ষতির ভয় ছাড়াই তাদের 'ওয়াচডগ' (Watchdog) ভূমিকা পালন করতে পারবে।
- **ARC সংস্কার বাস্তবায়ন:** আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ভিতর থেকে পরিবর্তন করতে দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের (2nd ARC) পরামর্শ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক আমলের **'গোপনীয়তার শপথ'**-এর পরিবর্তে **'স্বচ্ছতার শপথ'** গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

উপসংহার

একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে তথ্য হলো অক্সিজেনের মতো। ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেন স্বচ্ছতার পথ রুদ্ধ না হয়। একটি **'সচেতন নাগরিক সমাজ' (Informed Citizenry)** গড়ে তোলার জন্য RTI এবং DPDP আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি একটি সুস্থ গণতন্ত্রের নৈতিক দাবি। সুপ্রিম কোর্টের আসন্ন রায় এই দুই অধিকারের একটি সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করবে—এটাই কাম্য।

প্রশ্ন: *"DPDP আইন, ২০২৩-এর 'বৈধ ব্যবহার' (Legitimate Uses) কাঠামো এবং RTI আইনের গুরুত্ব হ্রাস একত্রে একটি 'একমুখী আয়না' (One-way Mirror) তৈরি করেছে, যা গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে।" — জানার অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে উদীয়মান সাংবিধানিক সংঘাতের আলোকে এই বিবৃতিটি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.3. ব্যঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে: সাংবিধানিক নৈতিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা

ভূমিকা:

ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারতে এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সংক্রান্ত বিতর্কগুলি প্রায়শই জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা এবং সাংবিধানিক পদাধিকারীদের মর্যাদার মতো বিষয়গুলির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রেক্ষাপট: সাম্প্রতিক বিতর্ক

- একটি **৫২ সেকেন্ডের ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন** (যেটিতে প্রধানমন্ত্রীর অবয়ব ছিল বলে অভিযোগ) নিউজ পোর্টাল 'দ্য ওয়্যার'-এর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে দেওয়া বা **ব্লক** করা হয়েছে।
- সরকার এই পদক্ষেপের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছে যে, এটি এমন কিছু **"তথ্যসমৃদ্ধ গুজব বা যাচাইহীন তথ্য"** ছড়াচ্ছিল যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে:
  - **প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা।**
  - **দেশের ভাবমূর্তি বা মর্যাদা।**
  - **বৈদেশিক সম্পর্ক।**
- **'এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া'** এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে একে সরকারের সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি ক্রমবর্ধমান **অসহিষ্ণুতার** লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছে।

- **মূল সাংবিধানিক প্রশ্ন:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ কি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি, নাকি এটি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একটি অপরিহার্য গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচ?

গণতান্ত্রিক তত্ত্বে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভূমিকা: একটি কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

গণতান্ত্রিক আলোচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire কেবল নিছক বিনোদন নয়, বরং এটি নাগরিক অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারির একটি পরিশীলিত মাধ্যম। এর কার্যাবলিকে মূলত তিনটি স্তম্ভে ভাগ করা যায়:

১. **দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা**

- **পদ্ধতি:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ রাজনৈতিক অলঙ্কারকে ছাপিয়ে শাসনের ভেতরের **অসংগতি, ভণ্ডামি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে** জনসমক্ষে উন্মোচিত করে।
- **প্রভাব:** হাস্যরস ও শ্লেষের মাধ্যমে জটিল নীতি বা আইনি বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে তোলার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে **রাজনৈতিক সচেতনতা** বৃদ্ধি পায় এবং শাসনপ্রক্রিয়া তাদের কাছে আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

২. **ভিন্নমতের 'সেফটি ভালভ' (Safety Valve)**

- **পদ্ধতি:** এটি রাষ্ট্রের প্রতি জনমানসের অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশের একটি **অহিংস ও সৃজনশীল পথ** প্রশস্ত করে।
- **প্রভাব:** গঠনমূলকভাবে সমালোচনার সুযোগ করে দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে উগ্র বা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়া তৈরির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৩. **জনমত ও রাজনৈতিক আলোচনাকে শক্তিশালী করা**

- **বিশ্বজনীন ঐতিহ্য:** উন্নত গণতন্ত্রে (যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রাজনৈতিক কার্টুন বা গভীর রাতের ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানগুলোকে **'ধারণার বাজার'** (Marketplace of Ideas)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **বিচারবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি:** আদালত প্রায়শই ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে বলেন যে—উপহাস সহ্য করার ক্ষমতা একটি **শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের** অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- **প্রভাব:** এটি জনমতের পরিধিকে বিস্তৃত করে এবং নিশ্চিত করে যে ভিন্নমত কেবল সহ্য করার বিষয় নয়, বরং তা জনজীবনের একটি **অপরিহার্য উপাদান**।

সাংবিধানিক কাঠামো: অনুচ্ছেদ ১৯ এবং যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক):** সকল নাগরিকের **বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার** মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমের (মুদ্রিত, ডিজিটাল, শিল্পকলা) সাহায্যে ধারণা বা মত প্রচারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(২):** রাষ্ট্রকে এই অধিকারের ওপর **"যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ"** আরোপ করার ক্ষমতা দেয়।
- **যৌক্তিকতা ও আনুপাতিকতার পরীক্ষা:** বিধিনিষেধ যাতে দমনে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিচারবিভাগ নির্দিষ্ট কিছু আইনি নীতি অনুসরণ করে:
  - **আনুপাতিকতার নীতি:** যেকোনো বিধিনিষেধ হতে হবে ন্যূনতম কঠোর। বিধিনিষেধের উদ্দেশ্যের সাথে এর একটি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে এবং এটি প্রতিকারের তুলনায় অত্যধিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চলবে না।
  - **পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ:** 'শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' মামলায় প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী, যেকোনো সেন্সরশিপ—বিশেষত ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লক করার ক্ষেত্রে—**স্বাভাবিক ন্যায়বিচার** (Natural Justice) অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে কন্টেন্ট নির্মাতাকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।
  - **স্বেচ্ছাচারিতা:** স্বচ্ছতা বা বিচারবিভাগীয় তদারকি এড়িয়ে যাওয়া ঢালাও বা "জরুরি" নিষেধাজ্ঞাগুলি অসাংবিধানিক হিসেবে গণ্য হয়, কারণ সেগুলো "যৌক্তিকতার পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হতে পারে না।

বাকস্বাধীনতা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপ সংক্রান্ত প্রধান বিচারবিভাগীয় নজির

- **শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৫):** সুপ্রিম কোর্ট আইটি আইনের **৬৬এ (Section 66A)** ধারাটিকে "অস্পষ্ট" এবং বাকস্বাধীনতার অন্তরায় হিসেবে বাতিল করে দেয়। আদালত নির্দেশ দেয় যে, কন্টেন্ট ব্লক করার আগে কন্টেন্ট নির্মাতার বক্তব্য শোনার পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ বজায় রাখতে হবে।
- **ইন্ডিবিলে ক্রিয়েটিভ বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার (২০১৯):** আদালত রায় দেয় যে, জনশৃঙ্খলার অজুহাতে সেন্সরশিপ না করে বরং **বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্তব্য**। সামাজিক অসংগতিগুলি প্রকাশ করার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপকে অত্যাবশ্যক হিসেবে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- **কাম্মা বনাম এম. জোতিস্বরূপন (২০১৮):** মাদ্রাজ হাইকোর্ট **অতিশয়োক্তিকে (Exaggeration)** ব্যঙ্গবিদ্রূপের একটি বৈধ ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আদালত একে গণতান্ত্রিক সমালোচনা এবং ভণ্ডামি উন্মোচনের জন্য একটি "সহজাত আক্রমণাত্মক হাতিয়ার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে।
- **সৃজনশীল সাংবাদিকতা নিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট:** আদালত ব্যঙ্গবিদ্রূপকে ভিন্নমত প্রকাশের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে বহাল রেখেছে। আদালতের মতে, হাস্যরস বা শ্লেষকে কোনো "**অতি-সংবেদনশীল**" ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বরং একজন **"যুক্তিবাদী মানুষের"** দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত।

ব্যঙ্গবিদ্রূপের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: প্রথম সংশোধনী এবং 'ম্যালিস' (Malice) স্ট্যান্ডার্ড**
  - **আইনি ভিত্তি:** 'ধারণার বাজার' বা Marketplace of Ideas-এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপকে প্রায় নিরঙ্কুশ সুরক্ষা প্রদান করে।
  - **বিচারবিভাগীয় মাইলফলক (হাসলার বনাম ফলওয়েল):** মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, সরকারি বা জনপদাধিকারী ব্যক্তিদের **"আপত্তিকর প্যারোডি"** সহ্য করতে হবে, যদি না সেখানে সরাসরি কোনো **"বিদ্বেষমূলক মিথ্যা"** (Actual Malice) থাকে।
  - **মূলনীতি:** প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মকর্তাদের উচ্চমাত্রার উপহাস সহ্য করার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন।
- **ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত (ECHR): শৈল্পিক স্বাধীনতা**
  - **আইনি ভিত্তি:** ইউরোপীয় কনভেনশনের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়, যা এমনকি সেইসব ধারণাগুলোকেও সুরক্ষা দেয় যা **"বিরক্তিকর, স্তম্ভিত বা বিচলিত"** করতে পারে।
  - **বিচারবিভাগীয় স্বীকৃতি (ভেরেইনিগুং বনাম অস্ট্রিয়া):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্বভাবগতভাবেই বাস্তবতাকে বিকৃত করে এবং শৈল্পিক প্রকাশ হিসেবে এটি উচ্চতর সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য।
  - **যৌক্তিকতা:** উসকানিমূলক ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি সহনশীলতা হলো **বহুত্ববাদ** এবং গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার পরিচয়।

ডিজিটাল যুগে ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **নিষেধাজ্ঞার অস্পষ্ট ভিত্তি:** ১৯(২) অনুচ্ছেদের অধীনে বৈধ ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং প্রকৃত ভুল তথ্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য না করেই বারবার **"জাতীয় নিরাপত্তা"** বা "জনশৃঙ্খলা"র দোহাই দেওয়া।
- **ভীতি প্রদর্শন ও স্ব-সেন্সরশিপ (Chilling Effect):** কঠোর আইনি পদক্ষেপের (মানহানি, আইটি আইন বা UAPA-এর মতো আইন) ভয়ে নির্মাতারা আইনি জটিলতা বা সামাজিক রোষ এড়াতে নিজেরাই নিজেদের কাজ সংকুচিত বা বন্ধ করে দিচ্ছেন।
- **নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক অতিসক্রিয়তা:** আইটি রুলস (২০২১/২০২৬)-এর অধীনে বর্ধিত ক্ষমতা সরকারকে স্বচ্ছতা বজায় না রেখে বা নির্মাতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই দ্রুত **"জরুরি"** ভিত্তিতে কন্টেন্ট ব্লক করার অনুমতি দেয়।

- **"হেকলারস ভেটো" (Heckler's Veto):** সংগঠিত গোষ্ঠীর চাপ বা হুমকির মুখে বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র যখন শিল্পীকে সুরক্ষা না দিয়ে উল্টো তাঁর বক্তব্যকেই দমন করে, যা কার্যত **অসহিষ্ণুতাকে** উৎসাহিত করে।
- **ফৌজদারি ও দেওয়ানি দায়বদ্ধতা:** স্বতন্ত্র সংবাদমাধ্যম এবং ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের আর্থিকভাবে ও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করতে কৌশলগতভাবে **ফৌজদারি মানহানি** এবং বড় অংকের দেওয়ানি মামলার ব্যবহার।
- **মেরুকরণ ও সংকুচিত নাগরিক পরিসর:** উপহাস বা সমালোচনার প্রতি ক্রমহ্রাসমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সহনশীলতা, যেখানে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার জায়গা নিচ্ছে **অতি-সংবেদনশীলতা** এবং তীব্র মেরুকরণ।

উত্তরণের পথ: ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি সুরক্ষা

- **আইনি সংজ্ঞার সংশোধন:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ/প্যারোডি এবং "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্যের" মধ্যে স্পষ্ট আইনি পার্থক্য তৈরি করতে হবে। **আনুপাতিকতার নীতি (Doctrine of Proportionality)** মেনে বিধিনিষেধগুলো এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে যাতে সৃজনশীল ভিন্নমতকে ভুলবশত "জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি" হিসেবে চিহ্নিত না করা হয়।
- **পদ্ধতিগত আইনি প্রক্রিয়া জোরদার করা:** ২০১৫ সালের **শ্রেয়া সিঙ্ঘল** মামলার নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে কন্টেন্ট নির্মাতাদের "আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার" নিশ্চিত হয়। ডিজিটাল কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে অবশ্যই লিখিত ও যুক্তিযুক্ত আদেশ দিতে হবে, যাতে সেটি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার উপযোগী থাকে।
- **'হেকলারস ভেটো' (Heckler's Veto) রুখে দেওয়া:** ২০১৯ সালের **ইন্ডিবিলে ক্রিয়েটিভ** মামলার নজির অনুসরণ করে বক্তব্য রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্তব্য স্বীকার করতে হবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে শিল্পীর কণ্ঠরোধ না করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিত উত্তেজিত জনতা বা উগ্র গোষ্ঠীর চাপ সামলানো।
- **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা গঠন:** ২০২৬ সালের আইটি রুলস-এ থাকা ৩ ঘণ্টার মধ্যে কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশের বিপরীতে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা উচিত। বিচারবিভাগ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থা "জরুরি" ভিত্তিতে দেওয়া আদেশগুলোর **পোস্ট-ফ্যাক্টো অডিট (Post-facto Audit)** করবে, যাতে প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা যায়।
- **ব্যঙ্গাত্মক অভিব্যক্তিকে অপরাধমুক্ত করা:** শাস্তিমূলক ফৌজদারি ব্যবস্থা (যেমন ফৌজদারি মানহানি বা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অভিযোগ) থেকে সরে এসে আনুপাতিক দেওয়ানি প্রতিকারের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটি সেই **'চিলিং এফেক্ট' (Chilling Effect)** দূর করবে যা স্বাধীন মাধ্যম ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের কণ্ঠরোধ করে।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতা বৃদ্ধি:** সাংবিধানিক সাক্ষরতার মাধ্যমে সমাজে সহনশীলতার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। একটি পরিপক্ক প্রজাতন্ত্রের উচিত ব্যঙ্গবিদ্রূপকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ওপর আঘাত হিসেবে না দেখে, বরং একটি **স্থিতিস্থাপক এবং স্ব-সংশোধনকারী গণতন্ত্রের** অপরিহার্য লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা।

উপসংহার

ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা স্যাটায়ার অনেক সময় সমালোচনামূলক এবং অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু সহিংসতায় উসকানি না দেওয়া পর্যন্ত এটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত। একটি পরিপক্ক গণতন্ত্র সব সময় সহনশীলতা নিশ্চিত করে, প্রকৃত নিরাপত্তা হুমকির সাথে সমালোচনার পার্থক্য বোঝে এবং দায়বদ্ধতা, ভিন্নমত ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

প্রশ্ন: *সাম্প্রতিক ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লকিং সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে, ভারতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire-এর সাংবিধানিক সুরক্ষা পর্যালোচনা করুন। বিচারবিভাগীয় রক্ষাকবচ ও ডিজিটাল যুগের উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় বাতলে দিন। (২৫০ শব্দ)*

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির অস্পষ্টতা

প্রেক্ষাপট:

- ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত **অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি** দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- এর মূল লক্ষ্য হলো সাম্প্রতিক **বাণিজ্যিক উত্তেজনা** প্রশমিত করা এবং বৃহত্তর পরিসরে বাণিজ্য আলোচনা পুনরায় শুরু করা।
- তবে **শুল্ক ছাড়**, কৃষিক্ষেত্রে সুরক্ষা কবচ, **নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স** (NTBs) এবং নীতি নির্ধারণের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এখনো উদ্বেগ রয়ে গেছে।

পটভূমি:

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের পর, দুই দেশ একটি **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির** লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছে। ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের **উচ্চ শুল্ক আরোপ** এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের ফলে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই **অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির** মূল লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কিছু শুল্ক হ্রাস করা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধান করা।

চুক্তিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ভারতের নির্দিষ্ট কিছু রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের **শুল্ক হ্রাস**।
- যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্প ও কৃষি পণ্যের ওপর **শুল্ক এবং নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স** (NTBs) কমানোর বিষয়ে ভারতের অঙ্গীকার।
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের **জ্বালানি ও বিমান** কেনার পরিমাণ বাড়ানোর ইঙ্গিত।

এই সমঝোতাকে একটি বৃহত্তর ও **পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য চুক্তির** পথে একটি 'বিশ্বাস গড়ার পদক্ষেপ' হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্ব:

১. **দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্তিশালীকরণ:** এই চুক্তি ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক স্তম্ভকে আরও সুদৃঢ় করবে। এটি প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, **সেমিকন্ডাক্টর** এবং গুরুত্বপূর্ণ **সরবরাহ শৃঙ্খল** (Supply Chain) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও পূর্ণতা দেবে।

২. **সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যকরণ:** বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠনের এই সময়ে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে এবং নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর **অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা** কমাতে সাহায্য করবে।

৩. **রপ্তানি-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। সেখানে বাজারের সহজলভ্যতা বাড়লে **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**-র মতো উদ্যোগের অধীনে ভারতের উৎপাদন শিল্প প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সহজ হবে।

৪. **ভূ-রাজনৈতিক বার্তা:** জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেও এই চুক্তিটি বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর সাথে ভারতের সক্রিয় বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততার একটি শক্তিশালী **ভূ-রাজনৈতিক সংকেত** দেয়।

৫. **পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) পূর্বসূরি:** এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে আরও গভীর **বাণিজ্যিক উদারীকরণের** একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

ভারতের জন্য সম্ভাব্য ইতিবাচক দিকসমূহ

১. **বাজারের উন্নত সুযোগ:** যুক্তরাষ্ট্রের **শুল্ক হ্রাস** ভারতের শ্রমনিবিড় খাতগুলো, যেমন— **বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে** ব্যাপকভাবে উপকৃত করতে পারে। মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ হলে রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি **কর্মসংস্থানের সুযোগ** তৈরি হবে।

২. **বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা:** এই চুক্তি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এর ফলে রপ্তানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি **পূর্বাভাসযোগ্য** (Predictability) বাণিজ্যিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

৩. **কৌশলগত অর্থনৈতিক ঐক্য:** ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক **কৌশলগত অংশীদারিত্বকে** আরও সুদৃঢ় করবে। এটি প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং **সরবরাহ শৃঙ্খল** (Supply Chains) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অস্পষ্টতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:

১. **কৃষিক্ষেত্রে সুরক্ষা কবচ:** ভারতের কৃষিখাত অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ার কারণগুলো হলো:
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আধিপত্য।
- পণ্যের **মূল্য স্থিতিশীলতা** এবং জীবনজীবিকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।
- অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে দানাশস্যের মতো সংবেদনশীল ফসলের জন্য **শুল্ক সুরক্ষার** বিষয়টি স্পষ্ট নয়, যা আগের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে (FTAs) বজায় ছিল।
- স্পষ্টতার অভাবে মার্কিন কৃষি প্রতিযোগিতার মুখে পড়ার অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

২. **নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স (NTBs) এবং জিএম (GM) আমদানি:**
- জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা **জিএম (GM) খাদ্য** আমদানিতে ভারতের বিধিনিষেধকে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যিক বাধা হিসেবে গণ্য করে আসছে।
- চুক্তিতে "দীর্ঘদিনের উদ্বেগ" নিরসনের কথা বলা হলেও, জিএম পণ্যের বিষয়ে ভারতের **নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো** (Regulatory Framework) পরিবর্তন করা হবে কি না, তা এখনো অস্পষ্ট।

৩. **শুল্কের অসমতা:**
- ভারত তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক পণ্যের ওপর শুল্ক এবং অ-শুল্ক বাধা (NTBs) কমাতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।
- অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কিছু শর্তে পুনরায় শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা ধরে রাখছে।
- যেহেতু মার্কিন শুল্ক এমনিতেই কম, তাই ভারতের পক্ষ থেকে বড় ধরনের **শুল্ক হ্রাস** চুক্তির ন্যায্যতা ও আনুপাতিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

৪. **শর্তাধীন বাণিজ্যিক চাপ:**
- বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত (যেমন—নির্দিষ্ট দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি) নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় শুল্ক আরোপের চাপ দিতে পারে।
- যদি বাণিজ্যকে **নীতি নির্ধারণী স্বায়ত্তশাসন** (Policy Autonomy) প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা উদ্বেগের বিষয়।

৫. **কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব:** ভারতের কর্মশক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষিনির্ভর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমাত্রায় যান্ত্রিক ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে:
- দেশীয় বাজারে পণ্যের দাম কমে যেতে পারে।
- **আয়ের স্থিতিশীলতা** ব্যাহত হতে পারে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংকট বাড়তে পারে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি দিক:** যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শুল্ক ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দেশেই আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই ধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপের বিপরীতে ছাড় দেওয়া ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন:
- বাণিজ্যিক আলোচনায় **আইনি সতর্কতা**।
- অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং **সংসদীয় তদারকি**।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

১. **সংবেদনশীল খাতের জন্য সুস্পষ্ট সুরক্ষা:** ভারতকে অবশ্যই শুল্ক কোটা (Tariff Rate Quotas), সুরক্ষা কবচ (Safeguard Clauses) এবং পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবেদনশীল কৃষি পণ্যগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

২. **অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কেবল শুল্ক সুরক্ষার ওপর নির্ভর না করে ভারতকে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এজন্য ভ্যালু চেইন, উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও লজিস্টিকসে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

৩. **স্বচ্ছ আলোচনা:** বাণিজ্যিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সুশৃঙ্খল **সংসদীয় তদারকি** নিশ্চিত করলে দায়বদ্ধতা ও জনবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

৪. **নিয়ন্ত্রণমূলক স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা:** খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়ম মেনে নিজস্ব আইন ও নিয়ম প্রয়োগের অধিকার ভারতকে বজায় রাখতে হবে।

৫. **বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্যকরণ:** কোনো নির্দিষ্ট বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে ইইউ (EU), আসিয়ান (ASEAN) এবং আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করতে হবে, যা ভারতের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াবে।

৬. **কৌশলগত সমন্বয়:** বাণিজ্য নীতিকে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক লক্ষ্য যেমন— **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**, **'আত্মনির্ভর ভারত'** এবং টেকসই কৃষির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উপসংহার:

ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিটি বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করলেও কৃষিখাতের সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণমূলক স্বায়ত্তশাসন এবং ভারসাম্যপূর্ণ ছাড়ের বিষয়ে কিছু উদ্বেগ রয়ে গেছে। ভারতকে অবশ্যই স্বচ্ছ আলোচনা নিশ্চিত করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক ও কৌশলগত স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবেদনশীল খাতগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

প্রশ্ন: *ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য সুফল এবং উদ্বেগজনক দিকগুলো পর্যালোচনা করুন। ভারত কীভাবে বাণিজ্যিক উদারীকরণ এবং সংবেদনশীল বা দুর্বল খাতগুলোর সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে? (১৫০ শব্দ)*

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

2.3.1. বিমুক্ত জাতিদের (Denotified Tribes) জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণিবিভাগ

প্রেক্ষাপট

- কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক সম্প্রতি **বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs)** নেতাদের আশ্বাস দিয়েছে যে, ২০২৭ সালের জনশুমারির দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের সম্প্রদায়ের তথ্য গণনা করা হবে।
- দশকের পর দশক ধরে প্রায় **১০ কোটিরও বেশি মানুষের** 'পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা' দূর করতে একটি "স্বতন্ত্র সেন্সাস কলাম" বা পৃথক তালিকার যে দাবি ছিল, এই পদক্ষেপ তারই প্রতিফলন।
- এর মূল লক্ষ্য হলো SC, ST এবং OBC-দের মতো এদেরও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে ঐতিহাসিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো।

- ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তর নীতিগতভাবে এতে সম্মত হলেও, এই সম্প্রদায়গুলোর জন্য একটি **সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিভাগ** না থাকা এখনও একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

ভারতের বিমুক্ত জাতি (DNTs) কারা?

- **বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs):** এই সম্প্রদায়গুলোকে ব্রিটিশ শাসনামলে "অপরাধী জাতি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসকদের ধারণা ছিল যে, নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায় জন্মগতভাবেই অপরাধপ্রবণ।
- **যাযাবর উপজাতি (NTs):** এই সম্প্রদায়গুলো যাযাবর জীবনযাপন করে। জীবিকা নির্বাহের জন্য (যেমন: পশুপালন, ব্যবসা বা ঐতিহ্যগত পরিষেবা) এরা স্থায়ী বসতি ছাড়াই নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্থান পরিবর্তন করে (উদা: বাঞ্জারা, রাবারি)।
- **আধা-যাযাবর উপজাতি (SNTs):** এই গোষ্ঠীগুলো আংশিক বসতি ও ঋতুভিত্তিক পরিযানের সমন্বয় ঘটায়। পশুপালনের প্রয়োজনে এরা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গবাদি পশু নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে (উদা: গাড্ডি, মালধারি)।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ভারতে বিমুক্ত জাতিদের বিবর্তন

১. **ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট (CTA), ১৮৭১:** ১৮৭১ সালে প্রণীত এই আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়কে "অপরাধী উপজাতি" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তাদের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা অপরাধকে জাতপ্রথার সাথে যুক্ত করে একে "বংশগত" বলে প্রচার করত।

২. **স্বাধীনতার পর বিমুক্তি (১৯৫২):** আয়ঙ্গার কমিটির (১৯৪৯) সুপারিশে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে এই বৈষম্যমূলক আইনটি বাতিল করে। আগে তালিকাভুক্ত (Notified) গোষ্ঠীগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে "বিমুক্ত" (Denotified) হয়, যার ফলে **'Denotified Tribes'** শব্দটির উৎপত্তি।

৩. **হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার আইন (Habitual Offender Laws):** আইনটি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু রাজ্য ১৯৫২ সালে **'অভ্যাসগত অপরাধী আইন'** কার্যকর করে। যদিও এতে "বংশগত অপরাধী" তকমা সরিয়ে দেওয়া হয়, তবুও এই সম্প্রদায়গুলোর ওপর পুলিশি নজরদারি ও টার্গেট করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

৪. **ক্রমাগত প্রান্তিককরণ:** আইনিভাবে **"অপরাধী জাতি"** তকমা ঘুচে গেলেও স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও এদের ওপর সামাজিক কলঙ্ক, পুলিশি পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে।

ভারতে বিমুক্ত জাতি (DNTs) গণনার ইতিহাস

- **প্রাথমিক জনশুমারি শ্রেণিবিভাগ (১৮৭১–১৯৩১):** যদিও ১৮৭১ সালের 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট' (CTA) এবং আধুনিক জনশুমারি একই সাথে শুরু হয়েছিল, তবে ১৯১১ সাল থেকে এই সম্প্রদায়গুলোকে স্পষ্টভাবে **"অপরাধী উপজাতি"** (Criminal Tribes) হিসেবে নথিবদ্ধ করা শুরু হয়। ১৯১১ এবং ১৯৩১ সালের জনশুমারিতে তাদের আলাদাভাবে গণনা করা হয়েছিল; ১৯৩১ সালই ছিল এই ধরনের শেষ জনশুমারি।
- **স্বাধীনতা-পরবর্তী স্থবিরতা (১৯৫২):** CTA বাতিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে **'বিমুক্তি'** (Denotification)-র পর এদের পৃথকভাবে গণনা করা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন ভারত এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, জাতিভিত্তিক গণনা শুধুমাত্র **তফসিলি জাতি (SC)** এবং **তফসিলি উপজাতি (ST)**-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ফলে বিমুক্ত জাতিগুলো (DNTs) কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত স্বীকৃতি পায়নি।
- **প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ (১৯৪৯ থেকে): আয়ঙ্গার কমিশন (১৯৪৯)** প্রথম এই জাতিগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে। ১৯৫২ সালের পর, বেশ কিছু সম্প্রদায়কে অনগ্রসর শ্রেণির অধীনে **"বিমুক্ত জাতি" (Vimukt Jatis)** হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এদের বেশিরভাগই SC, ST বা OBC বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **লোকুর কমিটি (১৯৬৫):** এই কমিটি লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়নের খাতিরে বিমুক্ত ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে একটি **স্বতন্ত্র বিভাগ** হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেছিল।

- **নাগরিক সমাজ ও কমিশন (১৯৯৮ থেকে):** ১৯৯৮ সালে **মহাশ্বেতা দেবী** এবং **জি. এন. দেবী** 'বিমুক্ত, যাযাবর ও আধা-যাযাবর উপজাতি অধিকার রক্ষা গ্রুপ' (DNT-RAG) গঠন করেন। এর ফলে একটি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ এবং পরবর্তীতে **বি.এস. রেঙ্কে**-র সভাপতিত্বে প্রথম **'ন্যাশনাল কমিশন ফর ডিএনটি'** (২০০৮) গঠিত হয়। **ভিকু রামজি ইদাতে**-র অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৭ সালে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। উভয় কমিশনই সঠিক শনাক্তকরণের জন্য একটি **বিশেষ জনশুমারির** ওপর জোর দেয়।
- **নীতি আয়োগের ঝুলে থাকা গবেষণা:** অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে নীতি আয়োগ একটি গবেষণার নির্দেশ দিয়েছিল, যা এই গোষ্ঠীগুলোর শ্রেণিবিভাগের সুপারিশ করে। তবে সেই রিপোর্টটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

বিমুক্ত জাতি (DNTs) সংক্রান্ত ইদাত (Idate) কমিশনের মূল সুপারিশসমূহ:

ভিকু রামজি ইদাত কমিশন বিমুক্ত জাতিগুলোর সামাজিক ও আইনি অবস্থান পর্যালোচনার জন্য গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান সুপারিশগুলো হলো:

১. **সম্প্রদায় শনাক্তকরণ:** প্রায় ১,২০০টি সম্প্রদায়কে বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs, NTs, SNTs) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এর মধ্যে প্রায় **২৬৭–২৬৮টি সম্প্রদায়কে** কোনো সাংবিধানিক বিভাগের (SC/ST/OBC) বাইরে পাওয়া গেছে।

২. **সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব:** SC এবং ST-এর পাশাপাশি **"তফসিলি বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি"** নামে একটি **তৃতীয় তফসিল (Third Schedule)** প্রবর্তনের সুপারিশ, যাতে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

৩. **স্থায়ী জাতীয় কমিশন:** সাময়িক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি **স্থায়ী জাতীয় কমিশন** গঠনের প্রস্তাব, যা এদের জন্য গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম তদারকি করবে।

৪. **অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট (PoA Act)-এর সম্প্রসারণ:** তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (**অত্যাচার প্রতিরোধ**) আইনটি এই সম্প্রদায়গুলোর জন্যও কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা জাতিগত সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা পায়।

৫. **অভ্যন্তরীণ উপ-শ্রেণিবিভাগ (Sub-Classification):** সংরক্ষিত শ্রেণিগুলোর অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যাযাবর ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে **"স্তরবিন্যাসিত অনগ্রসরতা"** (Graded Backwardness) দূর করতে উপ-শ্রেণিবিভাগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিমুক্ত জাতিগুলোর (DNTs) জন্য পৃথক শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

- **তথ্যাদির ঘাটতি পূরণ:** একটি নির্দিষ্ট জনশুমারি তালিকা দীর্ঘদিনের **'পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা'** দূর করবে। এর ফলে সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অঞ্চল-ভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।
- **শক্তিশালী আইনি ভিত্তি:** সুনির্দিষ্ট **সাংবিধানিক স্বীকৃতি** এই সম্প্রদায়গুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Action), বৃত্তি, কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং সুরক্ষামূলক আইনি ব্যবস্থার ভিত আরও মজবুত করবে।
- **অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকার নির্ধারণ:** বিমুক্ত জাতিগুলোর মধ্যে **উপ-শ্রেণিবিভাগ** করা হলে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত যাযাবর ও আধা-যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করা সহজ হবে। এটি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত **'স্তরবিন্যাসিত অনগ্রসরতা'**-র ধারণাকেই প্রতিফলিত করে।
- **সুশাসনের প্রতিফলন:** আনুষ্ঠানিক শ্রেণিবিভাগ সংশয়মুক্ত শংসাপত্র (Certification) প্রদান প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, নীতি তদারকি বাড়াবে এবং স্বচ্ছ ও প্রয়োজন-ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করবে।

বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের (DNTs) প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ঔপনিবেশিক আমলের কলঙ্কজনক তকমাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে গেলেও, ভারতের উন্নয়নের মূলধারা থেকে এই সম্প্রদায়গুলো আজও অনেক দূরে। তারা একাধারে ঐতিহাসিক, আইনি এবং সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন:

১. **আর্থ-সামাজিক প্রান্তিককরণ এবং সম্পদের অভাব:**

- **প্রজন্মগত দারিদ্র্য:** কাঠামোগত বঞ্চনার ফলে এদের মধ্যে সাক্ষরতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থায়ী বাসস্থানের তীব্র অভাব রয়েছে। বংশপরম্পরায় এদের কোনো সম্পদ বা ভূ-সম্পত্তি নেই বললেই চলে।
- **নথিগত অদৃশ্যতা:** যাযাবর জীবনযাপনের কারণে এদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকে না। ফলে রেশন কার্ড, ভোটার আইডি বা জাতিগত শংসাপত্রের মতো প্রয়োজনীয় **পরিচয়পত্র** সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটি তাদের রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

২. **সামাজিক কলঙ্কের 'দ্বৈত বোঝা':**

- **পদ্ধতিগত প্রোফাইলিং:** ১৯৫২ সালে আইন বাতিলের দীর্ঘ সময় পরেও প্রশাসনিক মানসিকতায় এদের প্রতি **"অপরাধপ্রবণতার কলঙ্ক"** আজও রয়ে গেছে।
- **জীবনযাত্রার অপরাধীকরণ:** তাদের ঐতিহ্যগত যাযাবর যাতায়াত ও পেশাকে প্রায়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের **'অভ্যাসগত অপরাধী আইন'** (Habitual Offenders Acts)-এর অধীনে তারা প্রায়ই পুলিশি হয়রানির শিকার হয়, যা আসলে ঔপনিবেশিক আমলের নজরদারিরই এক আধুনিক রূপ।

৩. **অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ও অস্পষ্টতা:**

- **সুবিধা বণ্টন ও বিচ্যুতি:** অধিকাংশ বিমুক্ত জাতি বর্তমানে SC, ST বা OBC তালিকার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর ফলে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়ে কোনো একক নীতিমালা তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **'ক্রমোচ্চ অসমতা'র ফাঁদ:** সংরক্ষিত শ্রেণির বড় তালিকাগুলোর মধ্যে এই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সামাজিকভাবে উন্নত গোষ্ঠীগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। ফলে সংরক্ষিত কোটার সুবিধাগুলো প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর কাছেই রয়ে যায়।

৪. **প্রশাসনিক ও আইনি অনিশ্চয়তা:**

- **শ্রেণিবিভাগের অনুপস্থিতি:** প্রায় **২৬৮টি বিমুক্ত সম্প্রদায়** এখনও পর্যন্ত কোনো SC, ST বা OBC তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই শ্রেণিবিভাগের অভাবে তারা সংবিধানের **১৫(৪) ও ১৬(৪)** অনুচ্ছেদের সুরক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা তাদের কোনো প্রকার সাংবিধানিক বা আইনি রক্ষাকবচ ছাড়াই চরম অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগ: সিড (SEED) প্রকল্প

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কর্তৃক প্রবর্তিত SEED (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) প্রকল্পটি বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের জীবিকা, শিক্ষা, আবাসন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমন্বিত সহায়তা প্রদান করে।

- **আর্থিক বরাদ্দ ও কার্যপদ্ধতি:** ২০২০-২৫ অর্থবর্ষের জন্য **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি NRLM, ফ্রি কোচিং, আবাসন প্রকল্প এবং ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির মতো বিদ্যমান পরিকাঠামোগুলোর মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।
- **SEED প্রকল্পের সমস্যাসমূহ:**
    - **DNT শংসাপত্রের বাধ্যবাধকতা:** প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার প্রধান শর্ত হলো রাজ্য সরকার প্রদত্ত **DNT শংসাপত্র**। এটি SC/ST/OBC পরিচয়ের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে থাকতে হবে।
    - **শংসাপত্র প্রাপ্তিতে বাধা:** বাস্তবে দেখা যায় কেবল হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যের কিছু জেলায় এই শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ সত্ত্বেও অনেক রাজ্য এটি দিতে দেরি করছে বা অস্বীকার করছে।
    - **তহবিলের অপব্যবহার:** প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম, যা প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের প্রভাবকে সীমিত করে দিচ্ছে।

- **নোডাল অথরিটির অভাব:** প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন সংস্থার (NRLM, স্বাস্থ্য দপ্তর ইত্যাদি) মধ্যে বিভক্ত। ফলে নির্দিষ্ট কোনো একক প্রতিষ্ঠান নেই যারা বিমুক্ত জাতিদের সার্বিক ফলের জন্য জবাবদিহি করবে।

আগামীর পথ: কৌশলগত নীতি ও প্রশাসনিক সংস্কার:

ঔপনিবেশিক আমলের সন্দেহভাজন তকমা থেকে বেরিয়ে এসে সাংবিধানিক সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সংস্কারগুলো অত্যন্ত জরুরি:

১. ২০২৭ সালের জনশুমারির মাধ্যমে তথ্যনির্ভর শাসন:

- **নির্দিষ্ট শনাক্তকরণ:** পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা কাটাতে রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তরকে অবশ্যই DNT/NT/SNT-দের জন্য একটি **পৃথক কলাম বা কোড** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **মানসম্মত প্রোটোকল:** যাযাবর জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখে স্ব-শনাক্তকরণের স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যাতে কোনো উপ-গোষ্ঠী বাদ না পড়ে।

২. সাংবিধানিক ও আইনি ক্ষমতায়ন:

- **স্বতন্ত্র তফসিল:** ইদাত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিমুক্ত জাতিদের একটি স্বতন্ত্র আইনি পরিচয় দিতে **সাংবিধানিক সংশোধনী**র মাধ্যমে একটি পৃথক তফসিল তৈরি করতে হবে।
- **অত্যাচার প্রতিরোধ:** সামাজিক প্রোফাইলিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়রানি থেকে রক্ষা করতে এদের **SC/ST (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন**-এর সমতুল্য আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক শক্তিশালীকরণ:

- **স্থায়ী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা:** বিমুক্ত জাতিদের অধিকার রক্ষা এবং কল্যাণমূলক কাজ তদারকির জন্য আইনি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি **স্থায়ী জাতীয় কমিশন** গঠন করতে হবে।
- **একীভূত শংসাপত্র প্রক্রিয়া:** শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত ও ডিজিটাল করতে হবে যাতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটি অভিন্নভাবে পাওয়া যায়।

৪. জনকল্যাণমূলক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ (SEED প্রকল্প):

- **সরাসরি বাস্তবায়ন:** প্রকল্পের তহবিল ব্যবহারের গতি বাড়াতে এবং প্রশাসনিক বিলম্ব কমাতে একটি বিশেষায়িত **DNT কল্যাণ বোর্ড**-এর মাধ্যমে সরাসরি এটি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা:** যাযাবর পরিবারগুলো যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, তখন যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ এনরোলমেন্ট ইউনিট এবং ডিজিটাল রেকর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিরা আজও ভারতের **"প্রান্তিকদের মধ্যেও অতি-প্রান্তিক"** হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২৭ সালের জনশুমারিতে এদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ; তবে একে সফল করতে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো এবং স্বতন্ত্র **সাংবিধানিক পরিচয়** নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, এই সম্প্রদায়গুলো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য এবং সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত অবস্থাতেই থেকে যাবে।

প্রশ্ন: *ভারতের বিমুক্ত (Denotified), যাযাবর (Nomadic) এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের (Semi-Nomadic Tribes) আর্থ-সামাজিক ও আইনি চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করুন। এই সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত পদক্ষেপের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

Click here to watch this video